# পুনর্ভর্তি ফি ॥ শিক্ষা নাকি বাণিজ্য

**মো. মাহিন উদ্দিন**

প্রকাশিত: ১৮:৫৫, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে প্রতিবছর একটি নীরব কিন্তু নির্মম উৎসব পালিত হয়- এর নাম পুনর্ভর্তি। উৎসবটি শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষকের জন্য। ভর্তি মানেই টাকা, আর পুনর্ভর্তি মানেই আরও টাকা- এ যেন শিক্ষার ধারাবাহিকতা নয়, বরং বাণিজ্যের নবায়ন। প্রশ্ন জাগে, একজন শিক্ষার্থী যখন একই প্রতিষ্ঠানে একই পাঠক্রমে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছে, তখন ‘পুনর্ভর্তি’ শব্দটি আসলে কোন নৈতিকতা থেকে জন্ম নেয়? শিক্ষা কি তাহলে একটি সাবস্ক্রিপশন সার্ভিস, যেখানে প্রতিবছর ফি না দিলে জ্ঞান বিতরণ বন্ধ হয়ে যায়?

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে রাষ্ট্র নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। আবার ১৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, রাষ্ট্র ‘একই ধারার গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা’ প্রতিষ্ঠা করবে এবং নিরক্ষরতা দূর

করবে। এখন প্রশ্ন হলো, যে শিক্ষা প্রতিবছর নতুন করে টাকা দিয়ে 'নবায়ন' করতে হয়, তা কি সর্বজনীন? নাকি এটি কেবল টাকার জোরে টিকে থাকা একটি সুবিধা? সংবিধান যেখানে শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে দেখছে, সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেন এটিকে পণ্যে রূপান্তর করছে, এই প্রশ্নটি কি রাষ্ট্র শুনতে পায় না! নাকি শুনেও শোনে না?

সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পুনর্ভর্তি ফি আজ এক প্রকার অলিখিত আইন। কোথাও নামমাত্র, কোথাও আবার এমন অঙ্ক, যা দেখে মনে হয় শিক্ষার্থী নয়, যেন নতুন কোনো বিনিয়োগকারী আসছে। মজার ব্যাপার হলো, এই ফি'র বিপরীতে শিক্ষার্থী কী পাচ্ছে, তার কোনো লিখিত নিশ্চয়তা নেই। না বাড়তি সেবা, না উন্নত শিক্ষা পরিবেশ, না কোনো আইনি চুক্তি। শুধু একটি রসিদ যা প্রমাণ করে, আপনি এখনো 'ছাত্র' হিসেবে টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (টএঈ) একাধিকবার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি আদায় না করার নির্দেশনা দিয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০-এ বলা আছে, ফি নির্ধারণে স্বচ্ছতা থাকতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের ওপর অযৌক্তিক আর্থিক চাপ দেওয়া যাবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, আইন কাগজে, আর ফি নোটিস বোর্ডে। পুনর্ভর্তি ফি যেন এমন এক কর, যার কোনো সংসদীয় অনুমোদন নেই, কিন্তু আদায় চলে নির্বিঘ্নে।

এখানে সবচেয়ে কৌতুককর বিষয় হলো যুক্তি। বলা হয় 'প্রশাসনিক খরচ', 'ডাটাবেজ আপডেট', 'আইডি নবায়ন', 'রেজিস্ট্রেশন' ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো, এই প্রশাসনিক কাজগুলো কি শিক্ষার অংশ নয়? একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কার্যক্রমের খরচ কি শিক্ষার্থীর ঘাড়ে আলাদা করে চাপানো ন্যায্য ? তাহলে তো শিক্ষক বেতন, বিদ্যুৎ বিল, চেয়ার-টেবিল সবকিছুর জন্য আলাদা আলাদা ফি নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি তাহলে জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র, নাকি খরচ ভাগাভাগির একটি করপোরেট অফিস?

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী, কোনো সেবার বিনিময়ে অযৌক্তিক মূল্য আদায় বা সেবার প্রকৃতি গোপন করা অপরাধ। শিক্ষা যদি সেবা হয় যা রাষ্ট্র নিজেই বিভিন্ন নীতিমালায় স্বীকার করে, তাহলে পুনর্ভর্তি ফি কি ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের শামিল নয়? নাকি শিক্ষার্থী এখানে ভোক্তা নয়, বরং নীরব দাতা? যে দাতা প্রশ্ন করলে তাকে বলা হয় 'পড়তে না চাইলে

চলে যান।'

পুনর্ভর্তি ফি মূলত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নীরব বাছাই প্রক্রিয়া। মেধা নয়, টিকে থাকার যোগ্যতা নির্ধারিত হয় ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে যেখানে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতার কথা বলা হয়েছে, সেখানে অর্থনৈতিক সামর্থ্যরে ভিত্তিতে শিক্ষার ধারাবাহিকতা নির্ধারণ কি সেই সমতার পরিপন্থি নয়? নাকি সংবিধান শুধু জাতীয় দিবসে পাঠ করার জন্য, বাস্তবে প্রয়োগের জন্য নয়?

সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, এই প্রক্রিয়াকে আমরা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছি। প্রতিবাদ নেই, প্রশ্ন নেই। অভিভাবকরা ভাবেন 'আর কতই বা টাকা!' শিক্ষার্থীরা ভাবে 'ডিগ্রি শেষ হোক আগে।' আর প্রতিষ্ঠানগুলো ভাবে 'সবাই দিচ্ছে, আপনিও দিন।' এভাবেই শিক্ষা নামক অধিকারটি ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে একটি কিস্তিভিত্তিক পণ্যে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন থেকেই যায়, পুনর্ভর্তি ফি কি সত্যিই শিক্ষার প্রয়োজনে, নাকি এটি শিক্ষাকে বাণিজ্যে রূপান্তরের একটি চতুর কৌশল? যদি শিক্ষা অধিকার হয়, তবে তার জন্য বারবার প্রবেশমূল্য কেন? আর যদি শিক্ষা বাণিজ্য হয়, তাহলে অন্তত সাহস করে তা স্বীকার করা হোক। কারণ, সংবিধানকে সামনে রেখে বাণিজ্য করা যতটা কৌশলী, ততটাই নিষ্ঠুর।

লেখক : শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ